Islamic Online Madrasha (IOM)
AQD101 Module:12
Majharul Islam Sayed

আরকানুল ঈমান পর্বঃ আসমানী কিতাব
কুরআনুল কারীম প্রসঙ্গ

* কুরআনের পরিচয়

* কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য

* কুরআনের বৈশিষ্ট

* কুরআন সংকলনের ইতিহাস

* কুরআন শিক্ষার ফযিলত

কুরআনের পরিচয়

কুরআনের অর্থ ও পরিচয় : কুরআন শব্দের অর্থ পাঠ করা, যা পাঠ করা হয়। আর পরিভাষায়-আল্লাহ তাআলা জিবরাঈল (আ.) -এর মাধ্যমে সুদীর্ঘ ২৩ বছরে মানব জাতির হেদায়াত হিসাবে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর উপর যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তার নাম আল কুরআন। [আল মুজামুল ওয়াসিত ও মায়ারিফুল কুরআন, বাংলা, মূল- মুফতি শফী (রহ), বাংলা অনুবাদ- মাওলানা মুহীউদ্দীন আহমেদ]

এবার আমরা কুরআন থেকেই কুরআনের পরিচয় জানবো।

● কুরআন আল্লাহর কিতাব :

وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

‘‘নিশ্চয় এ কুরআন বিশ্ব জাহানের রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে’’ [সূরা আশ-শু‘আরা-১৯২]।

قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

● কুরআন হলো নুর বা আলো : ‘অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আলো ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ এসেছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে শান্তির পথ দেখান, যারা তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তাঁর অনুমতিতে তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করেন। আর তাদেরকে সরল পথের দিকে হিদায়াত দেন’ [সূরা মায়িদাহ-১৫,১৬]।

● কুরআন মানবজাতির জন্য হেদায়াত :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

'রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী।' [সূরা বাকারা: ১৮৫]

●কুরআন মুমিনদের জন্য রহমাত :

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا

'আব আমি কবআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতিই বাড়িয়ে দেয়' [সূরা বনি ঈসরাইল:৮২]।

●কুরআন মুমিনদের জন্য রহমাত :

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا

'আর আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতিই বাড়িয়ে দেয়' [সূরা বনি ঈসরাইল:৮২]।

কুরআনের বৈশিষ্ট ও অলৌকিকত্ব

কুরআনের বৈশিষ্ট: কুরআনের অসংখ্য বৈশিষ্ট্য থেকে নিম্নোক্ত আয়াতগুলোর আলোকে কতিপয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করতে পারি।

১. কোরআন নাজিল করার পর তা সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা নিজেই নিয়েছেন যা অন্যান্য কোন ধর্মগ্রন্থের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

নিশ্চয় আমি উপদেশ বাণী তথা কুরআন নাজিল করেছি এবং নিঃসন্দেহে এর হেফাজতকারী আমি নিজেই' [সূরা আল-হিজর-৯]

২. কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য চ্যালেঞ্জ :

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

'বল, যদি মানব ও জ্বিন জাতি সবাই মিলে একত্রিত হয় যে, তারা এ কুরআন অনুরূপ কিছু আনয়ন করবে, তারা এ কুরআনের অনুরূপ কিছুই আনয়ন করতে পারবে না, যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়' [সূরা বনি ঈসরাইল: ৮৮]।

৩. কুরআন শিক্ষা সহজ :

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

'আর আমি তো কুরআন শেখার জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি'? [সূরা আল-ক্বামার:১৭]

৪. কুরআন জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস :

يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ

ইয়া-সীন। বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ' [সূরা ইয়াছিন:১-২]

আরো কতিপয় বৈশিষ্ট্য:

অধিক পঠিতব্য কিতাব: কুরআনের মতো এত বেশি পাঠ করা হয় পৃথিবীতে এমন কোন গ্রন্থ নেই। কোন ধর্মীয় গ্রন্থ, উপন্যাস, নাটক, ইত্যাদি যাই হোক। কারণ এ কুরআন পড়ে পৃথিবীর সকল ধর্মের মানুষ। অন্যান্য গ্রন্থের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করি যে, কিছু কিছু গ্রন্থ বিশেষ যুগে বিশেষ সময়ে মানুষের কাছে যতই সমাদৃত হোক কিন্তু কুরআনের মতো এতো অধিক পঠিত আর কোনো গ্রন্থ নেই।

কুরআন মুখস্তকারীর সংখ্যা অগনিত : এটি হচ্ছে পবিত্র কুরআনের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যে এই পৃথিবীতে গোটা কুরআনকে মুখস্ত করেছে এমন মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি।

আল কুরআনের কোন আয়াত প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিপরীত নয় : পবিত্র কুরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এই কুরআনের অসংখ্য আয়াতে বিজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনা করা। অথচ কুরআনের প্রতিটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, আধুনিক প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যশীল।

গোটা কুরআনকে কাব্যিক আকারে পেশ করা হয়েছে : আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে পথহারা মানুষদেরকে পথ দেখাবার জন্য প্রেরণ করেছে অসংখ্য নবী ও রাসুল, আর যেহেতু নবী রাসুলগণ নির্বাচিত নন বরং তারা আল্লাহর মনোনিত সুতরাং তারা যে আল্লাহর নবী একথা প্রমাণ করার জন্য সেই যুগে যে বিষয়টি সব চেয়ে আলোচিত ও আকর্ষণীয় তারই মত অথচ সেই জিনিস নয় এমন কিছুকে মু'জিযাহ হিসাবে প্রেরণ করেছেন আর আমরা জানি মোহাম্মদ(সাঃ) যে যুগে এবং যে স্থানে জন্ম গ্রহণ করেছেন, সেখানে সর্বত্র চলত কবিতার ছড়া ছড়ি তারা তাদের সাধারণ কথা বার্তাগুলো পর্যন্ত কবিতার মত বলার চেষ্টা করতো, উকাজের মেলা বসত সেখানে বিভিন্ন কবির আগমন ঘটত তারা কবিতা নিয়ে পরস্পর কাব্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকতো এই কারণে সে যুগে কুরআনকে আল্লাহর কালাম প্রমাণ করবার জন্য আল্লাহ তায়ালা মু'জিযাহ হিসাবে গোটা কুরআনকে কাব্যিক আকারে পেশ করেছেন। এবং সে কবিতার মান এতই উচ্চ পর্যায়ের ছিল যে সে যুগের বিখ্যাত কবি ইমরুল কায়েস কবিতা লেখা বন্ধ করে দেন এবং তিনি বলতেন যে, কুরআনের সামনে আমার এসব কবিতা চলবেনা। আপনি যদি কুরআনকে না থেমে পড়েন,তা হলে মনে হবে আপনি একটি প্রবন্ধ পাঠ করছেন। আর যদি থেমে পড়েন তাহলে মনে হবে একটি কবিতা আবৃতি করছেন।

কুরআনের আলোচনায় কোন সীমাবদ্ধতা নেই : আমরা জানি যে কেউ যখন কোন বিয়য়ে চিন্তা করে বা কোন কথা বলে বা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন তার সেই কথা বলা চিন্তা-চেতনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বিশেষ সময় স্থান কাল পাত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। শুধু তাই নয় এই সকল কর্ম-কান্ড ব্যক্তি স্বার্থ বা হীনমন্যতার ঊর্ধ্বে খুব কমই উঠতে পারে এই সকল কর্মকান্ড সম্পাদন কারীগণ যদি পুরুষ অথবা নারী হয়ে থাকে তাহলে তার কথা বলা বা

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা পুরুষ অথবা নারী কেন্দ্রিক হয়ে থাকে। যদি সে হয়ে থাকে শ্বেতাঙ্গ অথবা কৃষ্ণাঙ্গ তাহলে তার কথা বার্তা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা শ্বেতাঙ্গ বা কৃষ্ণাঙ্গ কেন্দ্রিক হয়ে থাকে ।

একটি আয়াতের সাথে আর একটি আয়াতের কোন বৈপরীত্ব নেই : পবিত্র কুরআন দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে নাযিল হয়েছে, অথচ একটি আয়াতের সাথে আর একটি আয়াতের কোন বৈপরীত্ব খুজে পাওয়া যাবে না

বারংবার পড়লেও খারাপ লাগেনা : মহাগ্রন্থ আল কুরআনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট। হলো এ কুরআন যতবারই পড়া হবে ততবারই ভাল লাগবে। লক্ষ করুন, একটা খুব জনপ্রিয় গান সেই গানটি কয়েক বার শোনার পর স্বাভাবিক ভাবেই আর ভাল লাগেনা। কিন্তু কুরআন সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেমন সূরা ফাতিহা আমরা দিন রাত ২৪ ঘন্টার মধ্যে শুধুমাত্র ফরজ নামাজেই ১৭ বার পাঠ করি এছাড়াও সুন্নত ও নফল নামাজে অগনিত বার পড়ে থাকি। কিন্তু আজো কারো মুখে শুনিনি যে সূরা ফাতেহা পড়তে বা শুনতে ভালো লাগে না।

অমুসলিমদের অধিকার দিয়েছে আল কুরআন : অনেকেই আমাদের কাছে বলেন,যে আপনারা যে কুরআন প্রতিষ্ঠার কথা বলেন কুরআন যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে অমুসলিমদের কি হবে?

এসব প্রশ্নকারীদের আমরা যখন জিজ্ঞাসা করি, অমুসলিমদের স্রষ্টা কে? তারা বলে আল্লাহ। এবার আমরা বলি এ কুরআন এসেছে কার কাছ থেকে তারা বলে আল্লাহ,তখন আমরা সেই ভদ্র লোককে বলি কুরআনের স্রষ্টা যে আল্লাহ অমুসলিমদের স্রষ্টাও সেই আল্লাহ,সুতরাং আপনি কি ভাবে চিন্তা করেন যে সেই কুরআন প্রতিষ্ঠিত হলে অমুসলিমদের অধিকার নষ্ট হবে।
আসল কথা হল এ পৃথিবীতে আল্লাহর যত নিয়ামত আছে তা সকলের জন্য প্রযোজ্য। এ দুনিয়াতে আল্লাহ কারো প্রতি বৈষম্য করেননি আল্লাহ পাকের যত নিয়ামত আছে তার ভিতরে সব চেয়ে বড় নিয়ামত হল আল-কুরআন। এই কুরআন প্রতিষ্ঠিত হলে কারো প্রতি কোন বৈষম্য হবে না। সকল জাতি,ধর্ম এবং বর্ণের মানুষ নিরাপদে থাকতে পারবে,ইসলামের ইতিহাস তার বাস্তব সাক্ষী। রাসুল(সাঃ)বলেছেন,যদি কোন মুসলিম কোন অমুসলিমের অধিকার হরণ করে তাহলে আমি কিয়ামতের দিন অমুসলিমের পক্ষাবলম্বন করবো।

নির্ভুল একটি কিতাব : মহাগ্রন্থ আল কুরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট হচ্ছে এটি একটি নির্ভূল কিতাব যার ভেতরে কোন প্রকার সন্দেহ সংসয়ের অবকাশ নেই।
এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ এটি একটি কিতাব যার ভেতরে কোন সন্দেহ নেই(সূরা বাকারা আয়াত-২) প্রিয় পাঠক কুরআন নাযিল হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত এ কুরআনের ভুল ধরার জন্য অনেক চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা হয়েছে,কিন্তু সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। পৃথিবীর অসংখ্য গবেষক,চিন্তাবিদ,আরবি ভাষায় যাদের পূর্ণ দখল রয়েছে তারা অনেক চেষ্টা করে অবশেষে ব্যর্থ হয়েছে । তাদেরই ভেতরের এক জন ড.মরিস বুকাইলি, যিনি,কুরআনের ভুল ধরার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন। অবশেষে এ কুরআনের কাছে মাথা নত করে দিয়েছে,শুধু তাই নয় বাইবেল, কুরআন এবং বিজ্ঞান নামে তিনি একটি বিশাল গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেই গ্রন্থটি পড়ে অসংখ্য অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করছে। যেহেতু এ কুরআন এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে, সেহেতু এ কুরআনের ভেতরে কোন প্রকার ভুল থাকতে পারে না। সুতরাং কুরআন হচ্ছে একটি নির্ভুল কিতাব।

কুরআন তার অনুসারীদের চরমভাবে আকৃষ্ট করে : পবিত্র কুরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে,কুরআন তার অনুসারীদের চরমভাবে আকৃষ্ট করে ধরে রাখে।
ইতিহাসে দেখা যায় এ কুরআনের অনুসারীদের উপর সীমাহীন নির্যাতন করেও তাদের কে এ কুরআনের বিশ্বাস থেকে এক চুল পরিমাণও বিচ্যুত করা যায়নি। এ কুরআনকে বিশ্বাস করার কারণে হযরত বেলালকে নির্মম নির্যাতন করা হয়েছে। তার গলায় রশি বেঁধে উত্তপ্ত বালুর উপর টেনে হিঁচড়ে নিয়ে বেড়ানো হয়েছে। এই কুরআন কে বিশ্বাস করার কারণেই হযরত সুমাইয়াকে নির্মমভাবে শহীদ করা হয়েছে। এই কুরআনের আন্দোলন করার কারণেই সাইয়েদ কুতুবকে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়েছে। জয়নব আল গাযালীর মত হাজার হাজার মানুষকে কারাগারে আবদ্ধ করে নির্মম নির্যাতন করা হয়েছে, কিন্তু তাদের কেউ-ই এর উপর বিশ্বাস থেকে এক চুল পরিমান বিচ্যুত হয়নি। সুতরাং এটিই হচ্ছে পবিত্র কুরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট যে,কুরআনের অনুসারীরা কুরআনের জন্য জীবন দিতেও দ্বিধা করে না।

কুরআন তার তেলাওয়াতকারীর ঈমান বৃদ্ধি করে : কুরআন যে সব মুমিন তেলাওয়াত করবে কুরআন তাদের ঈমানকে বৃদ্ধি করে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

প্রকৃত মুমিন এর বৈশিষ্ট হল আল্লাহর স্মরণে তাদের দিল কেঁপে উঠে এবং তাদের সামনে কুরআন তেলাওয়াত করা হলে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। তারা আল্লাহর উপর আস্থাশীল ও নির্ভরশীল হয়ে উঠে,নামাজ কায়েম করে এবং আল্লাহ প্রদত্ত রিজিক থেকে ব্যয় করে বস্তুত তারাই হচ্ছে সত্যিকারের মুমিন তাদের জন্য আল্লাহর নিকট রয়েছে খুবই উচ্চ মর্যাদা এবং আরো রয়েছে তাদের কৃতকর্মের ক্ষমা ও অতি উত্তম রিজিক (সূরা আনফাল আয়াত-২-৪)

কুরআন তার অনুসারীদের মর্যাদাবান করে গড়ে তোলে : মহাগ্রন্থ আল কুরআনকে যারা পড়বে বা তেলাওয়াত করবে এবং তার অনুসরণ করবে এ কুরআন তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেয় একটি কাঠকে আমরা কতটুকুই মুল্য দিয়ে থাকি কিন্তু সেই কাঠটি যখন রেহেল কাঠ বা আল কুরআন রাখার পাত্রে পরিণত হয় তখন সকলের কাছে সেই কাঠটির মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। রমযান মাস আরবী ১২ মাসের মধ্যে একটি মাস ছাড়া আর কিছুই নয়,কিন্তু যেহেতু এ মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে,সেহেতু এ মাসের মর্যাদা আল্লাহর কাছে অনেক বেশী হয়ে গিয়েছে। অনুরুপ ভাবে এক জন মানুষের মর্যাদা মানুষের কাছে বেড়ে যায় ,যখন তার ভেতরে আল কুরআনের জ্ঞান থাকে, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

তোমাদের ভেতর যারা জানে এবং যারা জানেনা তারা কি সমান ?

আল-কুরআন মানুষকে শান্তি,স্বস্তি এবং নিরাপত্তা দিতে সক্ষম : যে ভূ-খন্ডে আল কুরআন প্রতিষ্ঠিত হবে, এ কুরআন সে ভূ-খন্ডের লোকদেরকে পূর্ণ শান্তি,স্বস্তি দিতে সক্ষম। আমরা যদি ইতিহাসের দিকে তাকায় তাহলে দেখতে পাই, এ কুরআন যখন নাযিল হয়ে ছিল তখন সমগ্র পৃথিবী বিশেষ করে আরব জাতির অবস্থা ছিল চরম শোচনীয়, ধর্ম এবং নৈতিকতার সীমা ছাড়িয়ে তারা পশুর মত জীবন-যাপন শুরু করে ছিল,অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তারা হয়ে

গিয়েছিল চরম দেউলিয়া,দারিদ্র্য তাদের কে আষ্টে-পৃষ্টে বেঁধে ফেলেছিল, তাদের সমাজে কোন মানুষের নিরাপত্তা ছিলনা। আল কুরআন তাদের জীবন এবং সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটালো, অবশেষে তারা হয়ে উঠল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, তাদের সমাজে মানুষের শান্তি,স্বস্তি এবং নিরাপত্তা ফিরে পেল, নারী তার সতীত্বের নিরাপত্তা পেল,অর্থনৈতিক ভাবে তারা পরিপূর্ণ সচ্ছল হয়ে উঠল এবং অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছাল যে তাদের সমাজে ভিক্ষা নেওয়ার মত কোন মানুষ পাওয়া যেত না, কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَـكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ

”যদি কোন জনপদের লোকেরা ঈমান আনে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে,তাহলে আসমান ও যমিনের বরকতের দরজা তাদের জন্য খুলে দেওয়া হবে।” (সূরা আ’রাফ, আয়াত ৯৬)

কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য

কুরআনকে সঠিকভাবে ও সহজে বুঝতে হলে এ কথাটি জানতে হবে যে, আল্লাহ তা‘আলা কী উদ্দেশ্যে এ কিতাব নাযিল করেছেন। মানবজাতির আদিপিতা আদম (আলাইহিস সালাম) ও আদিমাতা হাওয়া (আলাইহিস সালাম)-কে জান্নাত থেকে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তারা শয়তানের ভয়ে অস্থির হয়ে গিয়েছিলেন। যে শয়তান এত কৌশল ও যোগ্যতার সাথে তাঁদেরকে জান্নাতে পর্যন্ত ধোঁকা দিতে পেরেছে, দুনিয়ায় না জানি ঐ শত্রুর হাতে কী দুর্গতি হয় এ আশঙ্কায়ই তাঁরা চিন্তিত হয়ে গিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন-

قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

“আমি হুকুম করলাম, তোমরা সবাই নীচে নেমে যাও। অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন হেদায়েত পৌঁছে, তবে যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়েত অনুসারে চলবে, তার উপর না কোন ভয় আসবে, না (কোন কারণে) তারা চিন্তাগ্রস্ত ও সন্তপ্ত হবে।” (সূরা বাকারা: ৩৮)

আল্লাহ তা‘আলার ঐ ঘোষণা অনুযায়ী মানবজাতিকে সঠিক পথে চলার সুযোগ দেয়ার উদ্দেশ্যেই নবী ও রাসূলগণের নিকট যুগে যুগে কিতাব পাঠানো হয়েছে। শয়তানের ধোঁকা, নাফসের তাড়না ও দুনিয়ার মোহ থেকে বেঁচে থেকে আল্লাহর হুকুম ও রাসূল (সা.)-এর তরীকা অনুযায়ী যারা চলতে চায়, তাদেরকে সব যুগেই আল্লাহর কিতাব সরল ও সঠিক পথ দেখিয়েছে। আল কুরআন আল্লাহর ঐ মহান কিতাবেরই সর্বশেষ সংস্করণ এবং যাঁর উপর এ কিতাব নাযিল হয়েছে তিনিও সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল (সা.)।

তাহলে বোঝা গেল, দুনিয়ার জীবনটা কীভাবে কাটালে দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তি পাওয়া যাবে– সে কথা শিক্ষা দেয়ার জন্যই কুরআন এসেছে। দুনিয়াদারি বাদ দিয়ে বৈরাগী, সন্ন্যাসী ও দরবেশ হওয়ার শিক্ষা দিতে কুরআন আসেনি। মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে হলে ঘর-সংসার, রুজি-রোজগার, বিয়ে-শাদি, খেত-খামার, ব্যবসা-বাণিজ্য, শাসন-বিচার, যুদ্ধ-সন্ধি ইত্যাদি যত কিছু মানুষকে করতে হয় সবই যাতে আল্লাহর হুকুম ও রাসূল (সা.)-এর তরীকা অনুযায়ী এসব করা হলে দুনিয়াদারিও দ্বীনদারিতে পরিণত হয়। আর ঐসব কাজ যদি মনগড়া নিয়মে

করা হয়, তাহলে সবই শয়তানের কাজ বলে গণ্য। মুমিনের জীবনে দ্বীনদারি ও দুনিয়াদারি আলাদা নয়। আল্লাহর হুকুম ও রাসূল (সা.)-এর তরীকা অনুযায়ী চললে গোটা জীবনের সব কাজই দ্বীনদারি বলে গণ্য।

আল-কুরআন সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

কুরআনের আয়াতসমূহকে লিখে রাখার ব্যপারে রসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীগণ (রাঃ)-কে শুরু থেকেই তাগিদ দিয়েছেন।

নুযূলের শুরু থেকেই আল-কুরআন লিখিতভাবে ও মুখস্থকরণের মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে। মাক্কাহ্ ও মাদীনায় তখন কিছু সংখ্যক সাহাবী (রাঃ) ছিলেন যাঁরা লিখতে ও পড়তে পারতেন। এই সাহাবীগণ (রাঃ)-এর কেউ না কেউ সব সময় রসূলুল্লাহ (স.) এর সান্নিধ্যে থাকতেন এবং লিখার প্রয়োজনীয় উপকরণও সাথে রাখতেন।

চরম সংকটাপন্ন অবস্থায় যখন রসূলুল্লাহ (সঃ) মাক্কাহ্ থেকে মাদীনায় হিজরাত করছিলেন, তখনও তাঁর সাথী সাহাবী আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) দোয়াত, কলম ও অন্যান্য লিখার সামগ্রী সঙ্গে রেখেছিলেন। ষষ্ঠ হিজরীতে হুদাইবিয়ার যে সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হয়েছিল, তা লিখিত হয়েছিল রসূলুল্লাহ (স.) এর সঙ্গে নেয়া লিখার উপকরণ দিয়ে। মাদীনায় রসূলুল্লাহ (সঃ) এর দরবারে শুধু আরবীতেই লিখার ব্যবস্থা ছিল তা নয়- গ্রীক, পাহলভী প্রভৃতি ভাষায় পত্রযোগাযোগ করার ব্যবস্থাও ছিল। যখন লিখন ছিল বিরল ব্যাপার তখন লিখতে-পড়তে পারতেন না এমন এক মহান ব্যক্তির মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ আল-কুরআনকে নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়ে চিরস্থায়ী বিশুদ্ধতার ব্যবস্থা করলেন। এ হলো আল-কুরআনের অন্যতম অলৌকিকতা।

ক) রসূলুল্লাহ (সঃ) এর জীবদ্দশায়ঃ
কুরআন নাযিলের শুরু থেকে শেষ দিন পর্যন্ত অনেক সাহাবী (রাঃ) বিভিন্ন সময়ে আল্লাহর রসূল (সঃ) এর কাছ থেকে শুনে কুরআনের বিভিন্ন অংশবিশেষ লিখে রেখেছিলেন এবং তাঁরা কুরআনের পুরোটা না হলেও অনেকটুকু মুখস্থ করে রেখেছিলেন। অনেক সাহাবী (রাঃ) ছিলেন যারা পুরোটা না হলেও কুরআনের অনেকটুকু মুখস্থ করে রেখেছিলেন এবং তা লিখেও রেখেছিলেন। অনেক সাহাবী (রাঃ) ছিলেন যারা পুরো কুরআন মুখস্থ করে রেখেছিলেন। আর ছিলেন ২৪ জন (মতান্তরে ৪৩ থেকে ৬০ জন) বিশিষ্ট কাতিব সাহাবী (রাঃ) যাঁরা রসূল (সঃ) এর কাছ থেকে শুনে লিখতেন এবং যা লিখতেন তা সাথে সাথেই রসূল (সঃ)-কে শুনিয়ে তাদের লিখার বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করতেন। এই কাতিব সাহাবীগণের (রাঃ) মাঝে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন চার জন খলিফাহ, যায়িদ বিন ছাবিত (রাঃ), যুবায়র ইবন 'আওয়াম (রা.), 'আবদুল্লাহ ইবন সা'দ (রা.), খালিদ ইবন সা'য়ীদ (রা.), আবান ইবন সা'য়ীদ (রা.), উবাই ইবন কা'ব (রা.), হানযালা ইবন রাভী (রা.), মু'আইকাব ইবন আবি ফতিমা (রা.), 'আবদুল্লাহ ইবন আরকাম ইবন শুরাহবিল (রা.) এবং 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা.)।

যেকোনো আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহর রসূল (সঃ) তাঁর কাতিব সাহাবীগণ (রাঃ)-কে বলে দিতেন সেই আয়াত কোন সূরায় কোথায় লিখতে হবে।

কুরআন নাযিলের শেষ দিন পর্যন্ত যাঁর কাছে যতটুকুই লিখা ছিলো, তাতে যে আয়াত যে সূরায় যে ক্রমে থাকার কথা সেভাবেই ছিলো। তাঁরা কেউই তাঁদের লিখিত সূরাহগুলো দুই মলাটের মাঝে বাঁধাই করা বইয়ের মত করে রাখেন নাই। সূরাহগুলো বিচ্ছিন্নভাবে তাঁদের কাছে সংরক্ষিত ছিল।

তবে তাঁরা সবাই জানতেন পুরো কুরআনে কোন সূরার পর কোন সূরাহ্ ক্রমান্বয়ে তিলাওয়াত করতে হয়, কারণ আল্লাহর রসূল (সঃ) তা তাঁদেরকে বলে দিয়েছিলেন। তাছাড়া তাঁরা সবাই আল্লাহর রাসূল (সঃ) এর পিছনে নিয়মিত সলাত আদায় করতেন।

অন্য সকল সাহাবী (রাঃ) এর চেয়ে যায়িদ বিন ছাবিত (রাঃ) এর ভূমিকা অনন্য। যেই সময় জিবরীল (আঃ) আল্লাহর রসূল (সঃ) এর মুখ থেকে শেষবারের মত পুরো কুরআনের তিলাওয়াত শুনেছেন, যায়িদ বিন ছাবিত (রাঃ) সেই সময় পুরোটা উপস্থিত থেকে শুনেছেন। সময়টা ছিল আল্লাহর রসূল (সঃ) এর জীবনের শেষ রমাদ্বান মাস। যে মাসে জিবরীল (আঃ) আল্লাহর রসূল (সঃ) এর মুখ থেকে দুই বার পুরো কুরআনের তিলাওয়াত শুনেছেন।

আল্লাহর রসূল (সঃ) এর ওফাতের পর অল্প দিনের মধ্যেই আরোও অনেকেই পুরো কুরআন মুখস্থ' করে ফেলেছিলেন এবং অনেকের কাছেই যার যার নিজের লিখা পুরো কুরআন সংরক্ষিত ছিল; কিন্তু তাঁরা কেউই তা বইয়ের মত দুই মলাটের মাঝে বাঁধাই করে রাখেন নাই- তাঁদের জন্য তা করার কোনো প্রয়োজনও ছিল না, কারণ তাঁরা সবাই কুরআন এর ব্যাপারে রসূল (সঃ) এর কাছ থেকে শুনার উপর ভিত্তি করে মুখস্থ করে তিলাওয়াত করাকেই গণ্য করতেন। একজন থেকে আরেকজন মুখস্থ' করেছেন।

কুরআন মুখস্তকারীদের 'ক্বারী' বলা হত। বহু বচন কুররা। এমনিতেই আরবরা বিস্ময়কর স্মরণ শক্তি অধিকারী, তদুপরি কুরআন হিফয করা ছিল গৌরব ও মর্যাদার কাজ, তাই তাঁরা অবলীলাক্রমে কুরআন মুখস্ত করতেন। সে সময়ে প্রসিদ্ধ কারীদের মধ্যে ছিলেন আবু বকর সিদ্দীক (রা.), 'উমর ফারুক (রা.), উসমান গণী (রা.), 'আলী (রা.), ইবন মাস'উদ (রা.), ইবন 'উমর (রা.), ইবন 'আমর (রা.), সালেম (রা.), উবাই ইবন কা'ব (রা.), মু'আয (রা.), তালহা (রা.), সা'দ (রা.), আবু হুরাইরা (রা.), 'আয়িশা (রা.), হাফসা (রা.), এবং উম্মু সালমা (রা.)। এরা সবাই মুহাজির। আনসারদের মাঝেও অনেক কুররা ছিলেন।

সাহাবীগণ কুরআনের আয়াতসমূহ দিয়ে যাবতীয় ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় 'আমাল করেছেন মুখস্থ' কুরআনের উপর ভিত্তি করে। লিখিত কুরআনের উল্লেখযোগ্য কোনো প্রয়োজনই তাঁদের আসলে ছিল না।

এখানে উল্লেখ্য যে, এই সময়কালে সাহাবীগণ (রাঃ) কুরআনের যা-ই লিখেছিলেন তা লিখে রেখেছিলেন কাপড়ে, পশুর চামড়া ও হাঁড়ে, গাছের পাতায়, খেজুর গাছের ডালে, সাদা পাথরের খন্ড ইত্যাদিতে।

কুরআন সাত আহরুফ-এ নাযিল হয়েছেঃ
আল্লাহ তা'আলা কুরআন নাযিল করেছেন এমনভাবে যাতে কিছু শব্দ আছে যেগুলো সাতটি ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক আরবী উচ্চারণ রীতিতে বা আহরুফ -এ উচ্চারণ করা যায়। রসূল (সঃ) এর দু'আর প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উম্মাতের সহজে পড়া ও মুখস্থ করার জন্য সাতটি আহরুফ -এ কুরআন নাযিল করেছেন। ব্যাপারটা অনেকটা এরকম যেমন একই ইংরেজী শব্দের আমিরিকান উচ্চারণ রীতি ও বৃটিশ উচ্চারণ রীতি ভিন্ন হয়। এমনকি কিছু শব্দকে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের ভিন্ন ভিন্ন (কিন্তু সমার্থক) শব্দ দিয়ে।

খ) প্রথম খলীফাহ আবু বাকর (রাঃ) এর ২ বছর শাসনামলেঃ
কারীদের অন্তরে এবং কাতিবদের লিখার মাধ্যমে রসূলুল্লাহ (সঃ) আল-কুরআন রেখে যান।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে রসূলুল্লাহ (সঃ) যেভাবে কুরআন বিন্যস্ত করে গেছেন তা কারীদের স্মৃতিতে ছিল। কিন্তু কাতিবরা যা লিপিবদ্ধ করেছিলেন তা একস্থানে দুই মলাটের মাঝে বাঁধাই করা বইয়ের মত করে একত্রিত করে রাখেন নাই।

বি'র-এ মাউনের ঘটনায় ৭০ জন কুররা শাহাদাত বরণ করেন। ইয়ামামার যুদ্ধে আরো ৭০ জনের অধিক কুররা শাহাদাত বরণ করেন। পরপর দুইটি যুদ্ধে প্রায় ১৪০ জন কুরআনের হাফীয শাহীদ হওয়ার পর খলীফাহ আবু বাকর (রাঃ)-সহ সকল প্রধান সাহাবীগণ অনুধাবন করলেন যে লিখিতভাবে পুরো কুরআনকে দুই মলাটে আবদ্ধ করে সংরক্ষন না করলে ভবিষ্যতে যদি আরো হাফীযগণ এভাবে শাহীদ হন, তাহলে কুরআন অসংগ্রহিত থাকার দরুন তাতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। কিন্তু আবু বাকর (রাঃ) এই কাজটি করতে ইতস্ততঃ করছিলেন কারণ তাঁর কাছে এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (সঃ) এর সরাসরি কোনো নির্দেশনা ছিল না। কিন্তু 'উমার (রাঃ) এর বারংবার চাপে পড়ে খলীফা আবু বাকর (রাঃ) অন্যান্য সাহাবীদের সঙ্গে আলোচনার পর রাসূলুল্লাহ (স.) এর ওফাতের ৬ মাস পর তা করতে রাজী হন। এই কাজের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য আবু বাকর (রাঃ) যায়িদ বিন ছাবিত (রাঃ)-কে নিয়োগ দেন।

যায়িদ বিন ছাবিত (রাঃ) চাইলে নিজেই তাঁর মুখস্থের উপর ভিত্তি করে পুরো কুরআন লিখে তা অনেক হাফীয সাহাবীগণের কাছে শুনিয়ে সত্যয়ন করে কাজটি সহজেই শেষ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে যা করলেন তা সত্যিই এক বিরাট হিক্মাতের কাজ। তিনি সকল সাহাবী (রাঃ)-কে আহবান করলেন তাদের লিখিত আয়াতগুলো নিয়ে আসার জন্য। যেকোনো একটি আয়াত লিখার ক্ষেত্রে যায়িদ বিন ছাবিত (রাঃ) এর কাছে অন্তত একজনকে লিখিত আয়াত নিয়ে আসতে হয়েছে যিনি আল্লাহর রসূল (সঃ) এর কাছ থেকে তাঁর লিখা আয়াত সত্যয়ন করেছিলেন এবং অন্তত দুইজন তা সাক্ষী দিতে হয়েছে যারা আল্লাহর রাসূল (সঃ) এর কাছ থেকে সে আয়াত সরাসরি শিখেছেন।

সূরাহ্ তাওবার শেষাংশ লিখিত আকারে কারো কাছে না পাওয়ার কারণে যায়িদ বিন ছাবিত (রাঃ) তা সংকলিত করতে পারছিলেন না। যদিও তিনি এবং তাঁর ন্যায় আরো অনেকে উক্ত অংশ স্মৃতিতে ধারণ করে রেখেছিলেন, তবুও লিখিত কপি না পাওয়া পর্যন্ত তা সংকলিত করার জন্য বিবেচনা করা হয়নি। পরে তা আবু খুযাইমা আনসারী (রা.) এর কাছ থেকে সংগ্রহ করেন ও সংকলিত করেন।

এভাবে আল্লাহর রসূল (সঃ) এর ওফাতের দুই বছরের মধ্যেই সকল সাহাবী (রাঃ) এর সাক্ষ্যসহ সমগ্র কুরআন লিখে দুই মলাটে আবদ্ধ করা হলো এবং তাকে মুসহাফ (অর্থাৎ বিচ্ছিন্নভাবে লিখা পাতার সংকলন) নামে ডাকা হতে থাকলো। এভাবে তিনি যে মুসহাফ তৈরি করেন তা সর্বদিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) কর্তৃক বিন্যস্ত কুরআন। এতে কোন রকম পরিবর্তন, পরিবর্ধন সংযোজন বা বিয়োজন করা হয়নি। ক্বারীদের অন্তরে সংরক্ষিত বিন্যাস এবং লিখিত কপির পাঠের সমন্বয়ে এ মুসহাফ তৈরি করা হয়।

এই মুসহাফটি মুসলিম উম্মাহর জন্য কোনো অফিসিয়াল মুসহাফ ছিল না। এর উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র কুরআনের সূরাসমূহ ক্রমান্বয়ে লিখে দুই মলাটের মাঝে রেখে দেয়া। এই মুসহাফটির তেমন কোনো ব্যবহার সাহাবী (রাঃ) এর মধ্যে ছিল না কারণ তাঁরা প্রত্যেকেই নিজের মুখস্থের উপর নির্ভর করতেন। অন্যদের কুরআন শেখানোর ক্ষেত্রেও তাঁরা নিজেদের মুখস্থের উপর নির্ভর করতেন।

আবু বাকর (রাঃ) এর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই মুসহাফটি তাঁর কাছেই ছিল।

গ) দ্বিতীয় খলীফাহ উমার (রাঃ) এর ১০ বছর শাসনামলেঃ
আবু বাকর (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর ওফাতের পর তাঁর সময়ে সংকলিত মুসহাফটি দ্বিতীয় খলীফাহ 'উমার (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর কাছে সংরক্ষিত ছিল। 'উমার (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর ওফাতের পর মুসহাফটি তাঁর কন্যা তথা রসূল (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) এর কাছে ছিল।

ঘ) তৃতীয় খলীফাহ উসমান (রাঃ) এর ১২ বছর শাসনামলে কুরআনের সংকলন :
ইসলাম যতই প্রসার লাভ করতে থাকলো, ততই বিভিন্ন অঞ্চলের (বিশেষ করে দুরবর্তী অঞ্চলের) নতুন মুসলিমদের মধ্যে ৭ আহ্রুফ-এ উচ্চারণ জানা-বুঝার তারতম্য হতে থাকলো। কেউ কেউ মনে করা শুরু করলো যে তার পড়াটা ঠিক আর অন্যের পড়াটা ঠিক না। আবার পড়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন আহ্রুফের সংমিশ্রন ঘটাচ্ছিলেন, কারণ সাধারণ নও-মুসলিমদের ৭ আহরুফের বিষয়ে ভাল জ্ঞান থাকার কথা না। আবার ইতিমধ্যে অনেকেই যার যার মত করে মুসহাফ লিখে ব্যবহারও করছিলেন। যেহেতু লিখার বানানের ক্ষেত্রে একজনের সাথে আরেকজনের লিখার তারতম্য হতেই পারে, তাই ব্যক্তিগতভাবে লিখিত এই মুসহাফগুলোর একই শব্দকে যে ভিন্ন ভিন্ন বানানে লিখা হচ্ছিল না সে ব্যপারে কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। তাছাড়া তখনো পর্যন্ত 'আরবী ভাষার কোনো সুনির্দিষ্ট বানান রীতিও আবিষ্কার হয় নি।

এরকম এক অবস্থার মধ্যেই হুজাইফাহ (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর মারফত উসমান (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) অবগত হন যে আজারবাইজানে জিহাদের সময় সিরিয়ান মুসলিমরা এবং ইরাকী মুসলিমরা কুরআন পড়ার বিভিন্নতা নিয়ে তর্ক ও দ্বন্দে লিপ্ত হচ্ছেন। হুজাইফাহ (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) আরো সতর্ক করলেন যে এভাবে চলতে থাকলে ইয়াহুদী ও নাসারার হাতে তাওরাত ও ইন্জীলের যে অবস্থা হয়েছে, কুরআনের অবস্থাও এ উম্মতের হাতে অনুরূপ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে উসমান (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সবার সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেন যে আবু বাকর (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর মুসহাফের উপর ভিত্তি করে সমগ্র উম্মাহর জন্য সুনির্দিষ্ট বানান রীতিতে একটি অফিসিয়াল মুসহাফ লিখে সবার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণীয় করে দিবেন- যাতে করে উম্মাহর মধ্যে ভবিষ্যতে কুরআন তিলাওয়াতের বিভিন্ন উচ্চারণের ব্যাপারে আর তর্ক-বিতর্ক না থাকে এবং কেউ মুসহাফ লিখতে চাইলে যেন এই অফিসিয়াল মুসহাফ ছাড়া অন্য কোনো মুসহাফ ব্যবহার করতে না পারে এবং ভবিষ্যতে মানুষ কুরআনের উচ্চারনের সাথে তার অর্থেরও বিকৃতি ঘটিয়ে ফেলতে না পারে।

যেহেতু আবু বাকর (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর সময়ে সংকলিত মুসহাফটি সুনির্দিষ্ট কোন বানান রীতিতে লিখা ছিল না, তাই সেই মুসহাফটিকে সরাসরি অফিসিয়াল মুসহাফ হিসাবে প্রচার করা যাচ্ছিল না।

উসমান (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এ কাজের জন্য যায়িদ বিন ছাবিত (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও আরো তিনজন কুরাইশ সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু), সা'য়ীদ ইবন আল আস (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এবং আবদুর রহমান ইবন হারিছ ইবন হিশাম (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে নিয়োগ দেন। তাঁদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় আবু বাকর (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর মুসহাফের শব্দসমূহকে এমনভাবে বানান করে লিখা যাতে পরবর্তীতে কেউ চাইলেও কোনো একটি শব্দকে বিভিন্নরূপে বানান করে তার উচ্চারণে তারতম্য ঘটাতে না পারে।

তাঁদেরকে আরোও নির্দেশ দেয়া হয় এমনভাবে চেষ্টা করতে যেন একটি শব্দকে প্রথমতঃ কুরাঈশী উচ্চারণে উচ্চারণ করা যায় এবং সাথে সাথে অন্যান্য আহরুফ দিয়েও উচ্চারণ করা যায়; যদি অন্যান্য আহরুফ দিয়ে উচ্চারণ করার সুযোগ রাখতে গিয়ে কুরাঈশী উচ্চারণ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে শুধুমাত্র কুরাঈশী উচ্চারণকে সংরক্ষন

করে বানান করার জন্য; যদি কোনো স্থানে বানান লিখতে গিয়ে মতবিরোধ হয়, তাহলে তিনজন কুরাইশ সাহাবী (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সেটার সঠিক কুরাঈশী উচ্চারনের উপযোগী বানানে লিখে দিবেন। এমনকি কিছু শব্দের ভিন্ন ভিন্ন আহরুফের উচ্চারণকে কুরাঈশী উচ্চারণের বানানে বহাল রাখার সুযোগ ছিল না বলে উসমান (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সেই শব্দগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন মুসহাফে লিখতে বলে দেন। ফলে ৪টি (মতান্তরে ৭ টি বা ৮ টি) মুসহাফ লিখা হয়।

এভাবে দ্বিতীয়বার মুসহাফ লিখা শেষ হলে উসমান (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এই দ্বিতীয়বার লিখা ৪টি (মতান্তরে ৭ টি বা ৮ টি) মুসহাফকে একজন করে দক্ষ ক্বারীসহ মুসলিম খিলাফাতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরণ করেন। এই মুসহাফ ও সাথে যাওয়া ক্বারীর ক্বিরাতকে অফিসিয়াল কুরআন হিসাবে অনুমোদন করে উসমান (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ফরমান জারি করেন।

অতঃপর সমগ্র মুসলিম খিলাফাতে বিভিন্ন জনের কাছে ব্যক্তিগতভাবে লিখিত যত মুসহাফ বা কুরআনের যা কিছু লিখিত ছিল সেগুলোর সব পুড়িয়ে ধ্বংস করার নির্দেশ দেন যাতে অফিসিয়াল মুসহাফটি ছাড়া আর কোনো লিখিত মুসহাফ কেউ ব্যবহার করতে না পারে। সকল সাহাবী (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এবং সকল মুসলিম তাদের যার কাছেই কুরআনের যা কিছু লিখিত ছিল তা সানন্দে স্বেচ্ছায় পুড়িয়ে ফেলেন, কারণ কুরআনকে লিখিতরূপে অবিকৃতভাবে সংরক্ষন করার জন্য সমগ্র মুসলিম উম্মাতে কারোও কাছে এর চেয়ে উত্তম আর কোনোও উপায় জানা ছিল না। প্রকৃত পক্ষে আল কুরআনের সংরক্ষণ, একত্রকরণ ও সঠিক পাঠদান স্বয়ং আল্লাহ্ নিজ দায়িত্বে সম্পাদন করেনছেন। তাই এ কুরআন যেমন ছিল, তেমন আছে, তেমন থাকবে।

রসূলুল্লাহ (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবদ্দশায় আল কুরআনের আয়াত ও সূরা যথাযথভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছিল। সাহাবায়ে কিরাম উক্ত বিন্যাস মোতাবেক তা হিফ্য করে ছিলেন। কিন্তু তা সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ করা হলেও পুরো কুরআনকে দুই মলাটে আবদ্ধ করে মুসহাফ আকারে একত্রিত করা হয়নি। কারণ ওয়াহয়ীর ধারক রসূলুল্লাহ (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁর কাছে ওয়াহয়ী আসত। যদি ভলিয়্যুম লিপিবদ্ধ হয়ে যেত, তাহলে কোন নতুন আয়াত নাযিল হলে ঐ মুসহাফে তা স্থাপন করা কঠিন হত বরং বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি হত। তাই ওয়াহয়ী আসা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত এ কাজ সম্ভব ছিল ন। আর রসূলুল্লাহ (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবিত থাকা অবস্থায় ওয়াহয়ী আসা বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। ওয়াহয়ী মুখস্ত করিয়ে দেয়া, তা নিখুঁতভাবে লিখিয়ে দেয়া ছিল রসূল (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দায়িত্ব যা তিনি পালন করে গেছেন। উক্ত মুখস্তকৃত এবং লিপিবদ্ধ ওয়াহয়ী একত্র করে প্রচারের দায়িত্ব ছিল উম্মাতের। সে দায়িত্ব উম্মাত যথাযথভাবে পালন করেছে।

বিশুদ্ধভাবে আল-কুরআন শিক্ষা ও পাঠের ফযিলতঃ

অন্তরে প্রশান্তি লাভঃ সত্যিকার মুমিন বান্দার অন্তর আল্লাহর জিকির তথা কুরআনুল কারীম তিলাওয়াতের মাধ্যমে প্রশান্তি লাভ করে। আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন-

الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

“যারা ঈমান আনে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহ্ জিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে। জেনে রাখ, আল্লাহর জিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়। [সূরা আর-রা’দঃ ২৮]

অপরিসীম নেকী লাভঃ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব (কুরআন মাজীদ) এর একটি বর্ণ পাঠ করবে, তার একটি নেকী হবে। আর একটি নেকি দশটি নেকীর সমান হয়। আমি বলছি না যে, ‘আলিফ-লাম-মীম’ একটি বর্ণ বরং আলিফ একটি বর্ণ, লাম একটি বর্ণ, মীম একটি বর্ণ। (অর্থাৎ তিনটি বর্ণ দ্বারা গঠিত ‘আলিফ-লাম-মীম’ যার নেকীর সংখ্যা হবে তিরিশ) [তিরমিযীঃ ২৯১০, হাসান]

আল্লাহর দরবারে শ্রেষ্ঠত্ব লাভঃ

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهم عَنْهم عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ, যে আল-কুরআন নিজে শেখে ও অন্যকে শেখায়’ [বোখারী]

আল্লাহর দয়া লাভঃ হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন পড়ানো এবং তেলাওয়াতের কারণে আমার কাছে কিছু চাইতে পারল না, আমি তাকে প্রার্থনাকারীর চেয়েও বেশি দান করি। সুবহানাল্লাহ!

কুরআন বান্দার পক্ষে সুপারিশ করবেঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তোমরা কুরআন পাঠ কর। কেননা কিয়ামত দিবসে কুরআন তার পাঠকের জন্য সুপারিশকারী হবে। [মুসলিম]

জান্নাতে উচ্চ মাকাম লাভঃ কিয়ামত দিবসে কুরআন অধ্যায়নকারীকে বলা হবে, কুরআন পড় এবং উপরে উঠো। যেভাবে দুনিয়াতে তারতীলের সাথে কুরআন পড়তে সেভাবে পড়। যেখানে তোমার আয়াত পাঠ করা শেষ হবে, জান্নাতের সেই সুউচ্চ স্থানে হবে তোমার বাসস্থান। [তিরমিজি]

- আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “পবিত্র কুরআন পাঠক, হফেজ ও তার উপর আমলকারীকে (কিয়ামতের দিন) বলা হবে, তুমি কুরআন কারীম পড়তে থাকো ও চড়তে থাকো। আর ঠিক সেইভাবে স্পষ্ট ও ধীরে

ধীরে পড়তে থাকো, যে ভাবে দুনিয়াতে পড়তে। কেননা, (জান্নাতের ভিতর) তোমার স্থান ঠিক সেখানে হবে যেখানে তোমার শেষ আয়াতটি খতম হবে।" [আবু দাউদঃ ১৮৬৮, তিরমীয়িঃ ২৯১৪]

তেলাওয়াতকারীর মা-বাবাকে মার্যদা দানঃ নবী করীম (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে, শিক্ষা করবে ও তদানুযায়ী আমল করবে, তার পিতা-মাতাকে দুটি পোশাক পরিধান করান হবে, যা দুনিয়ার সকল বস্তুর চেয়ে অধিক মূল্যবান। তারা বলবে, কোন আমলের কারণে আমাদেরকে এত মূল্যবান পোশাক পরানো হয়েছে? উত্তর হবে তোমাদের সন্তানের কুরআন গ্রহণ করার কারণে। [হাকেম]

- পক্ষান্তরে যারা কুরআন শিক্ষা করেনা তারা উভয়জাহানে আল্লাহর করুণা হতে বঞ্চিত, তারা বড়ই দুর্ভাগা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে হৃদয়ে আল-কুরআনের কোন অংশ নেই, সে হৃদয় বিরান গৃহের ন্যায়।

এত অপরিসীম ফযিলত কুরআন তেলাওয়াতে। তবে শর্ত হচ্ছে সে তেলাওয়াত অবশ্যই বিশুদ্ধ হতে হবে অন্যথায় তা খুবই দুঃখজনক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "অনেক কুরআন পাঠকারী এমন রয়েছে, কুরআন যাদেরকে অভিসম্পাত করে"। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রিয় হওয়ার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে। কেননা কুরআন শিক্ষা করা, মুখস্থ করা ও তাতে দক্ষতা লাভ করার ফযিলত সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে এবং তা মুখস্থ করবে এবং (বিধি-বিধানের) প্রতি যত্নবান হবে, সে সম্মানিত ফেরেশতাদের সাথে অবস্থান করবে। আর যে ব্যক্তি কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কুরআন পাঠ করবে এবং তার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখবে সে দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী হবে। [বুখারী, মুসলিম]

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কুরআন বুকে ধারণ করে মৃত্যুবরণ করার তৌফিক দান করুন। আমীন!!